পুলিশ তুমি যতোই মারো

অনিরুদ্ধ আহমেদ

ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময়ে একটি বেশ মজার স্লোগান উ''চারিত হতো পুলিশের বির''দ্ধে, 'পুলিশ তুমি যতোই মারো, তোমার বেতন একশ বারো।' সেই স্লোগানের মধ্যে যে ব্যঙ্গরসাত্মক উপাদান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, ছিল সো''চার প্রতিবাদ এক রকমের কিন' তার চেয়েও বড়ো কথা পুলিশের নিয়তির যে কোনো আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটে না সে নির্মম সত্যটিও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় পুলিশকে। সত্যবটে এখনকার পুলিশ ১১২ নয় এর বহুগুণ বেশি বেতন পায় কিন' ঐ সংখ্যাটি তো বস'ত প্রতীকী কেবল, বেতন যাই হোক বেতমারতেই হবে পুলিশকে নইলে তার আনুগত্য কর্তার প্রতি এবং সাম্প্রতিককালে কর্ত্রীর প্রতিও প্রমাণিত হয় না। সাধারণ জনগোষ্ঠীকে নির্যাতনের মাধ্যমে এই আনুগত্য প্রকাশ না করলেই কি নয়? ইংরেজের ঔপনিবেশিক আমল থেকে আমরা বেরিয়ে এসছি ৫৮ বছর আগে এবং পাকিস্তানের নব্য ঔপনিবেশিক যুগ ছাড়িয়েছি ৩৫ বছর আগে কিন' তারপরও পুলিশের মুল চরিত্রটি পাল্টায়নি একদম। অথচ যাদের উপনিবেশ ছিলাম আমরা সেই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরেজদের দেশে এই আধুনিক সময়ে দেখেছি, পুলিশ জনসেবায় উদ্যত। এ কেবল তাত্ত্বিক কোনো কথা নয়, একেবারে ব্যবহারিক সত্য। পশ্চিমের এই দেশগুলোতে, ব্রিটেনে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে এবং কী ইউরোপে কী উত্তর আমেরিকায় আমার কাছে মনে হয়েছে একাকী চলাচলের সময়ে পুলিশের চেয়ে বেশি সুহৃদ আমাদের বোধকরি আর কেউ নেই। অথচ এই পুলিশই হয়ে ওঠে আশ্চর্য এক বৈরীপক্ষ, দেশের মাটিতে হয় যেন উপনিবেশের প্রতিভু, কানসাটে, চট্টগ্রামে কিংবা ঢাকার রাজপথে পুলিশি তাণ্ডব দেখে মনে হয় যেন তারা ভিন্ন কোনো এক গ্রহের জীব, যেন তাদের সৃষ্টিই হয়েছে মানুষের বিপক্ষে তাদের অবস্থান গ্রহণের জন্য।

দুই.

পুলিশের এই বিস্ময়কর ভুমিকা, দুই বিশ্বে পুলিশের এই ভিন্ন রূপ আমাদের ভাবিয়ে তোলে। তৃতীয় বিশ্বের বহু রাষ্ট্রেই পুলিশ এক দানবীয় শক্তির তুল্য মুল্য হিসেবে বিবেচিত হয় অথচ উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে পুলিশ সেই আপ্তবাক্যেরই দ্বিধাহীন প্রয়োগ করে, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে পুলিশ বরঞ্চ বহুক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে, দুষ্টের পালন শিষ্টের দমনের নামান্তর। তাহলে যে প্রশ্নটা বড়ো হয়ে দাঁড়ায় তা হলো পুলিশের প্রশিক্ষণ ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্যে একটা বড়ো রকমের গলদ রয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আসলে পুলিশের এই বিপ্রতীপ ভুমিকা পেছনে বড়ো যে কারণ সেটি হলো ক্ষমতাসীন দলের একটি তল্পিবাহী শক্তি হিসেবে পুলিশ

বরাবরই নিজেকে বিবেচনা করে এসেছে। এই সমস্যার পেছনে যে মৌলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সত্য কাজ করছে তা হলো সরকারের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের যে একটি অতি আবশ্যকীয় পার্থক্য থাকার প্রয়োজন সেটি এখন প্রায় বিলুপ্ত। ক্ষমতাসীন দল কিংবা জোট যখন সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানকে করে তোলে দলীয় প্রতিষ্ঠানের মতোই নিজেদের করায়ত্ত, তখন বিভ্রান্ত্ম হয় প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই। আনুগত্য প্রদর্শন হয়ে ওঠে তখন সব চেয়ে জর‘‘রি প্রয়োজন, পুলিশের তো বটেই, নির্বাচন কমিশনের মতো একটি মর্যাদা সম্স্লন্ন প্রতিষ্ঠানেরও অবনতি ঘটতে থাকে দ্র‘‘ত। নির্বাচন কমিশনের সরকারের প্রতি নির্লজ্জ আনুগত্য, সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ কিন' পুলিশের এই নগ্ন আনুগত্য আমরা দেখে আসছি বরাবর। ভাবতে অবাক লাগে যে, এই পুলিশ বাহিনীই ১৯৭১ সালে রাজারবাগে পাকিস্ত্মান সরকারের আনুগত্য পরিত্যাগ করে আত্মত্যাগ করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে। আর পরবর্তী সময় এই পুলিশই বার বার ভুমিকা নিয়েছে গণবিরোধী। ভেবে দেখুন কানসাটে পুলিশের দানবের ভুমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘৃণ্য ঘটনা, চট্টগ্রামে চিত্রসাংবাদিকদের প্রহারের দৃশ্যের কথা, ঢাকার রাজপথে মানুষকে আহত করে, আহত ও রক্তাক্ত মানুষকে আবারো প্রহার করার ভয়াবহ দৃশ্য। বিশ্বের আধুনিকায়ন নিয়ে আমরা যখন গর্বিত বোধ করি, প্রধানমন্ত্রী ও পাতিমন্ত্রীরাও যখন উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যাওয়া দেশ নিয়ে আহ্লাদিত হন, তখন পুলিশের এই তাণ্ডবকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একি উন্নয়নেরই নিদর্শন না কি নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্রর মতোই সম্স্লুর্ণ এক রাজতান্ত্রিক আচরণ সাধারণ মানুষের প্রতি? কানসাটের ঘটনায় সরকারকে ঘাট শিকার করতে হয়েছে, চট্টগ্রামের ঘটনায়ও সরকার আবার বিব্রত হয়েছে কিন' ঢাকায় পরপর দুদিন বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বির‘‘দ্ধে সরকারের পুলিশ এবং অভিযোগ হ’ছে, সাদা পোশাকে তাদের পেটোয়া বাহিনী যে ঘটনা ঘটিয়েছে সে বিষয়ে সরকারের টনক নড়ছে না এখনো। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা বিশৃংখলা সৃষ্টি করছিলেন, অতএব তাদেরকে শায়েস্ত্মা করেছে পুলিশ, এ ধরনের সরল ব্যাখ্যা এবং সরকারি নির্লিপ্ততা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ঘেরাও র‘‘খবার জন্য সরকার যে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল, সে ১৪৪ ধারার আওতার বাইরের এলাকাগুলোতেই পুলিশ সাধারণ মানুষের ওপর চড়াও হয়েছে নৃশংস নির্মমতার সঙ্গে। বিএনপি এবং তার সঙ্গে যারা এখন সরকারের অংশিদারিত্বে আছে তারা সকলেই জানে যে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে স্বৈরশাসক এরশাদও পুলিশ ও বিডিআর নামিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ ও বিভাজন সৃষ্টি করেও তার গদিকে টেকসই করতে পারেননি। খালেদা জিয়া নিজেও ১৯৯৬ সালে একটি কথিত নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতায় টিকতে পারেননি। কিন' মুস্কিল হ’ছে এই যে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার অভ্যাসটুকু বর্জন করেন

ক্ষমতাসীনরা প্রায়শই এবং তারা মনে করেন যে ক্ষমতায় থাকার জন্যই তাদের জন্ম।

তিন.

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন জোট বোধকরি আরেকটি সহজ সত্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হ’’ছ যে, তাদের বির‘‘দ্ধে বিরোধী ১৪ দলীয় জোট বর্তমানে এক ধরনের আন্দোলনে রয়েছে। আন্দোলনের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন’ নিরেট বাস্-বতা হ’’ছ দেশে এখন একটি রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের বির‘‘দ্ধে পুলিশি নির্যাতন কখনই জয়লাভ করতে পারেনি। স্বরাষ্ট্রমন্¿ক যতোই কঠোর হাতে এই আন্দোলন অবদমনের নির্দেশ দিক না কেন, বুঝতে হবে যে জঙ্গিবাদ দমন, সন্¿াস দমন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন দমন একই বিষয় নয়। অথচ সন্¿াস ও জঙ্গিবাদের বির‘‘দ্ধে দীর্ঘদিনের পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ছিল প্রবাদতুল্য বরঞ্চ বিস্ময়কর হলেও সত্য যে রাজশাহী এলাকায় পুলিশের মদদেই মৌলবাদী সন্¿াসীরা প্রতিপক্ষকে গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশের প্রহার নয়, প্রহরায় জঙ্গিরা মিছিল করেছে সদর্পে। পরে অবশ্য অবস্থা বেগতিক দেখে র‌্যাবের মাধ্যমে শীর্ষ জঙ্গি নেতাদের ধরা হয়েছে। যদিও আটক এ সব নেতাকে নিয়ে রিমান্ডের নামে কী ঘটছে সে কথা এখনো আমরা জানি না। এরই মধ্যে পুলিশ ব্যতিব্যস্- হয়ে পড়েছে তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের নতুন মহড়ায় যাতে এই সরকারের মেয়াদ পুরণের আগেই, কর্মকর্তারা পায় পদোন্নতি, কর্মচারীরা হন পুরস্কৃত। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান যদি হন বিএনপির নীলনকশা অনুযায়ী, তা হলে এই পেটোয়া পুলিশের পোয়াবারো। এ রকম সুখস্বপ্ন অনেক পুলিশই হয়তো দেখেছেন কিন’ পুলিশের কিছু কর্মকর্তার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়লেও বাকিরা বঞ্চিত থাকেন বরাবরই। পুলিশ তাই বর্তমান সরকারের এই প্রান্-িক মুহর্তে অতি সক্রিয় কেন? এর সহজ জবাব হ’’ছ বিরোধীদের প্রতিবাদ আন্দোলনের মুখে সরকারের প্রতিক্রিয়াও বেশ উগ্র। তারা প্রথম রাতেই বিড়াল মারার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন কিন’ বোঝেননি তাদের নিপীড়নের যে অমানিশার সুচনা হয়েছিল ২০০১ সালে বিরোধী কর্মীদের ওপর গ্রামেগঞ্জে আক্রমণ চালিয়ে সেই অমানিশার এখন অবসান ঘটতে চলেছে। এই শেষ রাতে বিড়াল মারার ফল কী খুব ভালো হবে।

চার.

আরো একটি প্রশ্ন প্রায়শই উ’’চারিত হয়। সরকারি দলের মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া দুচোখে বিস্ময় নিয়ে জানতে চান, কেন এই রাজনৈতিক আন্দোলন, যখন বিরোধী ও সরকারের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পত্রবিনিময় চলছে? মান্নান ভুঁইয়ার এই জিজ্ঞাসা রাজনৈতিক

পর্যবেক্ষকদের কাছে নিতান্ত্মই বোকা বোকা জিজ্ঞাসা। তিনি যে স্বর্গীয় নিষ্পাপ নিয়ে যে প্রশ্ন করেন, তাতে তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন না, এ কথা স্বপ্রমাণিত। ঝানু রাজনীতিক হিসেবে মান্নান ভুঁইয়া সাহেবের নিশ্চয়ই জানা আছে যে বিরোধী দলের সঙ্গে তাদের আলোচনা বিষয়ে কী কৌশল অবলম্বন করা হ’েছ। আলোচনার মুলোটুকু নাকের সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে কালক্ষেপণের যে কৌশল সরকারি জোট গ্রহণ করেছে, তার বিপক্ষে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রেখে বিরোধী দলও আন্দোলনের কৌশল বজায় রেখেছে। আলোচনার বিষয়ে সরকারের আন্ত্মরিকতার অভাবের একাধিক প্রমাণ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত্ম মুল আলোচ্যসুচি অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নিয়োগ সংক্রান্ত্ম সংস্কারের বিরোধিতা করে এসেছেন প্রকাশ্য জনসভায়। বিষয়টি নিয়ে আপাতত তিনি নীরব হয়েছেন, তার রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের উপদেশে। কিন' তাতে প্রধানমন্ত্রী কিংবা তার দলের আন্ত্মরিকতা প্রমাণিত হয় না। আলোচনায় স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি ও দলকে অন্ত্মর্ভুক্ত করার প্রয়াসে যাতে আলোচনা আরো বিলম্বিত হয় সে সব কৌশল সরকার প্রয়োগ করে যা’েছ। কাজেই যে আলোচনা সম্পর্কে এতো আলোচনা হ’েছ তার সম্ভাব্যতা নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সংশয় আছে পর্বতপ্রমাণ। কাজেই বিরোধী জোট বিকল্প হিসেবে আন্দোলকে বেছে নিয়েছে। তাতে সরকারের পতন ঘটানোর চেয়েও বড়ো লক্ষ্য হ’েছ সরকারের প্রতি রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ। এই ধরনের আন্দোলন কোনো দেশেই অগণতান্ত্রিক কোনো বিষয় নয়। কাজেই তাদের বির“দ্ধে বিরোধী জোট আন্দোলনে রয়েছে এই সত্যটি তারা স্বীকার করে নিলেই পুলিশি নির্যাতনের কোনো যুক্তি থাকে না। আইনশৃংখলা রক্ষা করতে পুলিশের দায়িত্বকে কেউ অবমুল্যায়িত করে না কিন' পুলিশ যখন বস'নিষ্ঠতা হারিয়ে সরকারি দলের অনুগত বাহিনী হিসেবে বিরোধীপক্ষকে তার রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে অবৈধ বাধা প্রয়োগ করে, তখন পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণা পুঞ্জীভুত হয়। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী দুর্ভাগ্যবশত নিজেদের ঐ স্ত্মরে আবার নামিয়ে এনেছে। টেলিভিশনের পর্দায় যখন দেখি যে পুলিশি আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে মানুষ লুটিয়ে পড়েছে এবং তাকে পুলিশ আবার প্রহার করছে তখন পুলিশ যে রক্ষক হতে পারে মানুষের স্বাধীনতার, জানমালের সে কথা তো মনে হয় না। সরকারি নেতার মাল রক্ষা করতে গিয়ে জনগণের জান নিয়ে উদ্যত এই পুলিশ আবারো কী সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে যে ইতিহাস ঊনসত্তরের, নব্বইয়ের কিংবা সম্প্রতি কানসাটে তাদের নিপীড়নের।

পাঁচ.

পুলিশকে একক ভাবে দায়ী করাও যথার্থ হবে না কারণ তাদের মধ্যে যে মানসিকতার জন্ম দেওয়া হয়, তা হলো তাদের দায়িত্ব এবং আনুগত্য ক্ষমতাসীন দলের প্রতি, জনগণ সেখানে গৌণ এবং

জনগণ যদি হয় সরকারবিরোধী তা হলে তারা পরিত্যাজ্য এবং তাদের ওপর হামলা চালানো পুলিশের 'পবিত্র' কর্তব্য। এই মানসিকতার যারা জন্ম দেন তাদের জবাবদিহিতার প্রয়োজন রয়েছে সবার আগে। সরকারের যে কোনো স্তর থেকেই পুলিশ আদিষ্ট হোক না কেন, সেই আদেশের পেছনে নৈতিকতা কতোটুকু কাজ করছে সেটাই বড়ো ব্যাপার। সত্যবটে পুলিশ নিজে এই এথিক্সের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে না। কিন্তু যারা পুলিশকে পরিচালনা করেন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন বলে জোর গলায় দাবি করেন, তারা কী জানেন না পুলিশ পরিচালনার এথিক্স। যারা ভয় বা ভীতি বা কোনো আনুগত্যের বশবর্তী হয়ে কাজ না করার শপথ গ্রহণ করেন সানন্দে, তারা পরের দিনই ভুলে যান কী করে এই সব নৈতিক সত্য। আমাদের দুর্ভাগ্য আরো একটি স্থানে। যে সংসদে এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার সুযোগ থাকতে পারতো, সেই সংসদ এখন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রয়েছে। বিরোধী দলের দীর্ঘদিন ধরে সংসদ বর্জন তার একটি কারণ কিন্তু অন্য কারণগুলোও খুব একটা গৌণ নয়। সন্ত্রাস থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নিপীড়নের কোনো প্রসঙ্গই সংসদে আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি এবং সংসদ কেবল মন্ত্রিপরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাবের ওপর একটি অবশ্যম্ভাবী হ্যাঁ-সূচক ভোটগ্রহণের স্থান হয়ে রয়ে থাকলো গত কয়েক বছর। তাও আবার কোরামের অভাবে অধিবেশন বিলম্বিত হয় বার বার। কাজেই পুলিশি আচরণসহ সমস্ত নির্যাতনের প্রসঙ্গ যে ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে আলোচিত হতে পারতো, সেই পর্ষদও এখন নিতান্তই সরকারের বশংবদ। বিরোধী দল সেখানে যায় না, গেলেও তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। এই পরিস্থিতি যে বিস্ফোরণোন্মুখ একটি পরিবেশের সৃষ্টি করছে সেটি সংশিষ্ট সকল পক্ষকেই অনুধাবন করতে হবে। আলোচনা আলোচনা খেলা করে, আলোচনার দরজা বন্ধ করার মানসিকতা যদি থাকে, তা হলে আমরা নতুন সংকটে উপনীত হবো। কিন্তু এখনকার মতো জরুরি কাজ হচ্ছে পুলিশের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় স্বাধীন তদন্ত। কেবল কানসাট কিংবা চট্টগ্রাম নয়, ঢাকা শহরে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেও তারা যে মারমুখী হয়েছে, লাল বাগ, ধানমন্ডি, বাংলামোটর কিংবা অন্যত্র, সে সম্পর্কেও স্বাধীন তদন্ত এবং দোষী কর্মকর্তাদের শাস্তি প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে, শায়খ আব্দুর রহমানের মতো সন্ত্রাসীরা যখন পুলিশি হেফাজতে খোশ মেজাজেই থাকে, সেই সময়ে পুলিশের হাতেই সাধারণ মানুষ রক্তাক্ত হয় রাজপথে, শহরে মফস্বলে সর্বত্র। শিষ্টের দমন দুষ্টের পালন করে আর কতোকাল পার পেয়ে যাবে যারা পক্ষপাতদুষ্ট থাকে হালুয়া-রুটির জন্য? কাজেই আবারো সেই কথা বলার সময় এসছে একটু ভিন্নভাবে, পুলিশ তুমি যতোই মারো, বারে বারে তুমিই হারো। আর হেরে যায় তোমাকে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন যারা, তারাও।

অনিরুদ্ধ আহমেদ : আমেরিকা প্রবাসী সাংবাদিক, লেখক। লেখাটি ভোরের কাগজে প্রকাশিত